



## Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 328 - 336

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# সমরেশ বসু-র উপন্যাস : লড়াকু শ্রমজীবী নারী

ড. নবনীতা বসু হক

Email ID: [nabanitabasu@gmail.com](mailto:nabanitabasu@gmail.com)



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

### Keyword

Bengali fiction,  
class-gender,  
Samaresh Basu's,  
Uttaranga,  
Jagaddal, Ganga.

### Abstract

This research paper examines the precarious and resistant existence of working-class and marginalized women through a close reading of selected novels by Samaresh Basu—Uttaranga, Jagaddal, Ganga, BT Road-er Dhare, and Tanaporen. Samaresh Basu foregrounds the lived realities of class and gender exploitation shaped by economic transformation, industrialization, and capitalist expansion in colonial and post-colonial Bengal, articulating these processes through women's bodies, labour, and intimate relationships. In his fiction, women are not reduced to passive objects of sympathy; rather, they emerge as active participants in the production system, skilled negotiators of survival, and, in many instances, agents of silent yet persistent resistance.

In Uttaranga, the character of Latifa embodies the illusion of liberation promised by colonial modernity, where the transition from village life to industrial labour does not alleviate women's oppression but merely reconfigures its form. Jagaddal exposes the brutal politics of the female body, particularly through the figure of the woodcutter's wife and other women labourers, revealing how inadequate wages and unsafe working environments render sexual exploitation a structural inevitability. In Ganga, characters such as Himi and Pachi articulate the intertwined experiences of poverty, desire, and resistance within the fishing community, producing a nuanced portrayal of female self-awareness. In BT Road-er Dhare, Lotan's wife stands as a figure of overt defiance against patriarchal language and everyday violence. Conversely, Tanaporen interrogates dominant notions of infertility, creativity, and social morality through the relationship between Tuki and Panchu, destabilizing entrenched gendered assumptions.

The central argument of this study is that in Samaresh Basu's fiction, working-class women are not merely victims of history; even from its margins, they actively participate in its making. Through a dispassionate realist mode, Basu demonstrates that colonial development and industrialization do not constitute emancipation for women but instead inaugurate new regimes of servitude. His representation of struggling working-class women thus stands as a significant textual archive for class-gender analysis in modern Bengali fiction.

**Discussion**

সমরেশ বসু বাংলা কথাসাহিত্যে ধ্রুপদী কথাকার। যদিও তাঁর কিছু উপন্যাসের ভাষা অশ্লীল বলে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের ভন্ডামি নয়, তিনি স্বাগত জানান, শ্রমজীবী মানুষকে, অবশ্য তাঁর তাদের প্রতি সহমর্মিতা যেমন থাকে, তেমন অবিচ্ছেদ্য মানুষ হিসেবে সেই জন জীবনের নারীদের চিহ্নিত করেন।

কারখানা, বাজার, রাস্তাঘাট বা বস্তি— সবখানেই তাদের দেহ শ্রমের যন্ত্র এবং একই সঙ্গে ভোগের বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবু এই নারী আত্মসমর্পণ করে না; বরং পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে টিকে থাকার কৌশল রপ্ত করে। প্রদত্ত গবেষণাপত্রে কয়েকটি উপন্যাসের নারীদের নিয়ে আলোচনা করা হল।

**উত্তরঙ্গ :** সমরেশ বসুর উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' নারী চরিত্রের কেবল পারিবারিক পরিসরের অনুষ্ণ নয়; বরং উপনিবেশিক অর্থনৈতিক রূপান্তর, শ্রেণি-বিভাজন ও পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোর প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। পুরুষদের জীবনযাত্রায় যে ধ্বংস নেমে আসে, তার বহুগুণ ভার বহন করে নারী—শরীর, শ্রম ও সম্মানের বিনিময়ে। এই দিক থেকে লতিফা চরিত্রটি হয়ে ওঠে উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রতীক।

**১. নারী : উৎপাদন ব্যবস্থার নীরব শিকার—** ফরাসডাঙ্গার তাঁতি কানু ভড়ের স্ত্রী, পবন চাঁড়ালের বউ, কাঠুরে শ্রীনাথের দুই স্ত্রী—এরা প্রত্যেকেই অর্থনৈতিক ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা হারায়। পুরুষেরা যখন আত্মহত্যা করে, পালিয়ে যায় বা ভেঙে পড়ে, তখন পরিবার টিকিয়ে রাখার দায় এসে পড়ে নারীর ওপর।

কানু ভড়ের স্ত্রী চটকলে মজুরনীর কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়— এটি কেবল জীবিকা বদলের ঘটনা নয়, বরং স্বাধীন শিল্পী পরিবারের পতনের চূড়ান্ত চিহ্ন। নারী এখানে 'শেষ আশ্রয়', অথচ সেই আশ্রয় নিজেই অনিরাপদ।

**২. লতিফা : আশা ও প্রতারণার মধ্যবর্তী নারী—** গণি মিঞার স্ত্রী সুন্দরী লতিফা চরিত্রটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। জমি নিলামে উঠে গেলে গণি মিঞা যে স্বপ্ন দেখে— চটকলের শ্রমিক জীবনে স্ত্রীকে নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচবে, মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পাবে— তা আসলে এক ভ্রান্ত আধুনিকতার কল্পনা।

গ্রামের মহাজন যেখানে অর্থনৈতিক শোষক, সেখানে কলকারখানার মালিক ও সাহেবরা শোষণের আরও সূক্ষ্ম ও ভয়াবহ রূপ। লতিফার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কোনও মুক্তি আনে না; বরং শোষণের ক্ষেত্র বদলায়।

**৩. চটকল বস্তি : নারীর দেহের নতুন উপনিবেশ—** চটকল বস্তিতে লতিফার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আমরা দেখতে পাই কাভু, কাঠুরে বৌ কিংবা পবন চাঁড়ালের স্ত্রীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। মিল মালিক ত্রকসেন সাহেবের মতো চরিত্রেরা এখানে কেবল পুঁজির প্রতিনিধি নয়, তারা নারীদেহের ভোক্তা।

গ্রামের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যতটা নিষ্ঠুর, কলবস্তির 'আধুনিকতা' ততটাই নির্লজ্জ। এখানে নারীর শ্রম ও যৌনতা —উভয়ই পণ্যে পরিণত। এই বাস্তবতায় বলা যায়, লতিফার 'নিস্তার নেই' — না গ্রামে, না কলবস্তিতে।

**৪. ধর্ম, সংস্কার ও নারী—** লখাইয়ের মা মনসার বরপুত্র হয়ে ওঠা কিংবা মুরলী দাসের বোষ্টম আখড়ার ভাঙন —এই ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিসরের রূপান্তরেও নারীরা নীরব দর্শক। ধর্ম এখানে নারীর রক্ষাকবচ নয়; বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অংশ। লতিফা মুসলমান নারী হয়েও যে নিরাপত্তা পায় না, তা প্রমাণ করে—শোষণের প্রক্ষেপে ধর্ম গৌণ, লিঙ্গই মুখ্য।

অন্যদিকে লেখক জানান, শ্যাম শান্ত মানুষ। লখাই-এর সঙ্গে কালীর সম্পর্ক তার বুকো নতুন আনন্দ এনে দিয়েছে। নারান তার সহোদর ভাই, কালীর সাক্ষাৎ দেওয়ার। কিন্তু নারান যেন ঘরে থেকেও বাইরে। আপনায় হয়েও পর। অমন সুন্দর কাঁচের বউয়ের মুখ চাইতে যে চোখ ফিরিয়ে পর। আমন সুন্দর কাঞ্চন বউয়ের মুখ চাইতে যে চোখ ফিরিয়ে থাকে, সে মানুষ কালীর কাছে ভুললেও দুদিন সোহাগ করেনি, ধার ধারে না গালগল্লের। তার মজলিস অন্য খানে, মনের খেয়ালের সাধ মেটাতে ঘরে বাইরে। সেদিক থেকে, পর হয়েও পর থাকেনি যে লখাই, কম কথার মানুষ হয়েও আপন মানুষ কালীকে চিনতে তার ভুল হয়নি। সে বললে, তুই কি পাগল হয়েছিস বউ? তবে গাঁয়ের এ মিছে রটিয়েদের একবার

আমি দেখে নেব। আর এসব যদি সত্যি হত, তবে স্যামনেদের পদ্মপুকুরের পাড়ের মাটি কি এতই শক্ত হয়ে গেছে যে, দু হাতে ধরে তোকে আমি পুতে দিতে পারব না?

সে কথা শুনে শিউরে উঠেছে কালী, কিন্তু শান্তি পেয়েছে। শ্যাম তাকে বার বার বলে দিয়েছে, তোর লখাই দেওর মা মনসার বর পাওয়া ছেলে, যে যাই বলুক, পেটের ছেলের চেয়ে ওর আদর কম নয়। সেদিন ঘরের ছেচে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য শত্রুকে উপলক্ষ্য করে প্রায় সারাদিন কালী তার নতুন পুরনো গালাগালি ও শাপ-মন্যিতে জগদলের আকাশ ভরে তুলেছিল।<sup>১</sup> আর লখাই যে দেশেরই মানুষ হোক, তবু মানুষ তো! কালীকে বুঝতে তার বেশি দেরি হল না।<sup>২</sup>

**৫. লতিফা : প্রতীকী পাঠ**— লতিফা কোনও বিদ্রোহী নারী নয়, আবার নিছক নিষ্ক্রিয় ভুক্তভোগীও নয়। সে স্বামীর স্বপ্নে অংশ নেয়, নতুন জীবনের আশায় গ্রাম ছাড়তে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তার ইচ্ছা কখনোই সিদ্ধান্তে পরিণত হয় না।

উপনিবেশিক অর্থনীতিতে নারীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, আধুনিকতার নামে দ্বিগুণ শোষণের প্রতীক, এবং পুরুষের স্বপ্নের বোঝা বহনকারী এক নীরব অস্তিত্ব।

উপন্যাসে নারী চরিত্ররা— বিশেষত লতিফা গ্রাম থেকে কলকারখানায় যাত্রার পথে হারিয়ে যাওয়া মানবিকতার দলিল। সমরেশ বসু দেখিয়েছেন, উপনিবেশিক উন্নয়ন নারীর জন্য মুক্তি নয়; বরং তা এক নতুন দাসত্ব।

লতিফা তাই কেবল একটি চরিত্র নয়— সে জনপদের অন্তর্গত সেই সব নারীর প্রতিনিধি, যাদের জীবনে ইতিহাস ঘটে, কিন্তু ইতিহাসে তারা নাম পায় না।

**জগদল :** ‘জগদল’ উপন্যাসে উপনিবেশিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে নির্মম বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে, তার সবচেয়ে নগ্ন ও ভয়াবহ প্রকাশ ঘটে নারীশ্রম ও যৌন শোষণের ক্ষেত্রে। গ্রাম থেকে চটকল— এই যাত্রা কেবল অর্থনৈতিক রূপান্তরের নয়; এটি নারীর দেহকে পুঁজির অধীন করে তোলার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কর্মরত মজুরনীদের জীবন এই দেহ রাজনীতির প্রত্যক্ষ দলিল। লেখক জানান, -

“সর্বহারা শ্রমিকজীবনের দারিদ্রলাঞ্ছিত জীবনকথার বাস্তবায়ন এই উপন্যাস।”<sup>৩</sup>

### নারী শ্রম, যৌন শোষণ ও দেহরাজনীতি

**কাঠুরে বউয়ের শ্রম :** রংখানায় কাজ করা মেয়েরা সারাদিন কারখানার কঠোর শ্রম শেষে রাতের বেলায় দেহ ব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়— এই তথ্য উপন্যাসের অন্যতম তীব্র বাস্তব উচ্চারণ। এখানে দেহব্যবসা কোনও ব্যক্তিগত নৈতিক বিচ্যুতি নয়, বরং শ্রমিক নারীর জীবিকা রক্ষার শেষ অবলম্বন। দৈনিক মজুরি এতই অপ্রতুল যে শ্রমের সঙ্গে শরীর বিক্রি না করলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে নারীদেহ এখানে দ্বিগুণ শোষণের শিকার—দিনে শ্রমিক, রাতে পণ্য।

এই প্রেক্ষিতে কাঠুরে বউয়ের চরিত্রটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামে থাকাকালীন সে স্বামীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে— এটি গ্রামীণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চেনা ছবি। কিন্তু কলকারখানার জগতে এসে সেই অত্যাচার শেষ হয় না; বরং তার রূপ বদলায়। এখানে আর একক স্বামী নয়, বরং একাধিক পুরুষ—সর্দার, দালাল, সহকর্মী, মালিক— তার দেহের উপর অধিকার দাবি করে। বারবার ধর্ষিত হতে হতে সে একসময় অনুভূতিহীন, নির্বিকার হয়ে পড়ে। এই নির্বিকারতা কোনও মানসিক দৃঢ়তা নয়; এটি দীর্ঘ শোষণের ফলে সৃষ্ট আত্মরক্ষামূলক অবশতা।

উপন্যাসে কাঠুরে বউয়ের বৃদ্ধ মজুর ত্রিলোচনকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়া গভীর প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে। এখানে প্রেম বা কামনার প্রশ্ন নেই; রয়েছে নিরাপত্তার ন্যূনতম বোধ। তরুণ, ক্ষমতাবান পুরুষদের লালসার বিপরীতে বৃদ্ধ, দুর্বল ত্রিলোচন তুলনামূলকভাবে কম হিংস্র, কম আগ্রাসী। ফলে এই নির্বাচন আসলে স্বাধীন পছন্দ নয়; এটি সহিংসতার মাত্রা কমানোর এক করুণ কৌশল। নারীর ‘পছন্দ’ এখানে নির্ধারিত হয় পুরুষতান্ত্রিক সহিংসতার ভৌগোলিক মানচিত্র দ্বারা।

ডাকাতে বিমলির রংখানা শুধুমাত্র একটি কর্মক্ষেত্র নয়; এটি নারীদেহের এক নতুন উপনিবেশ। গ্রামে যেখানে সামাজিক রীতি ও সংস্কার নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করত, সেখানে কলবস্তিতে সেই নিয়ন্ত্রণ নেয় পুঁজি ও ক্ষমতা। ধর্ম,

পরিবার কিংবা সম্প্রদায়—কোনো কিছুই এখানে নারীর রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে না। মুসলমান লতিফা, হিন্দু কাঠুরে বউ বা চাঁড়াল সমাজের নারী—সবার অভিজ্ঞতা প্রায় অভিন্ন। এতে স্পষ্ট হয়, উপনিবেশিক পুঁজিবাদে শোষণের মূল নির্ধারক শ্রেণি ও লিঙ্গ, ধর্ম নয়।

সমরেশ বসু এখানে নারীর যৌন শোষণকে আলাদা কোনও সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখাননি; বরং একে অর্থনৈতিক কাঠামোর অনিবার্য ফল হিসেবে স্থাপন করেছেন। মজুরি কম → অতিরিক্ত আয়ের প্রয়োজন → দেহ ব্যবসা— এই কার্যকারণ সম্পর্ক তিনি নির্মোহভাবে উন্মোচিত করেছেন। ফলে পাঠক বুঝতে পারে, এই নারীরা ‘পতিতা’ নয়; তারা ব্যবস্থার দ্বারা উৎপাদিত শিকার।

আরও গুরুত্বপূর্ণ, লেখক নারীর কণ্ঠস্বরকে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ করে তোলেন না। কাঠুরে বউয়ের নির্বিকার চেতনা, মজুরীদের নৈশ জীবন— সবই বর্ণিত হয় প্রায় নথিভুক্ত বাস্তবতার ভঙ্গিতে। এই শৈল্পিক সংযমই উপন্যাসের রাজনৈতিক শক্তি বাড়িয়ে তোলে। কারণ এখানে সহানুভূতির আবেদন নয়, বরং কাঠামোগত অন্যায়ে উন্মোচন মুখ্য। উপন্যাসে হরির মা কালো দুলেনি বলে, -

“গঙ্গার ঘাটে বসে বসে। মস্ত এক পাতর ছিল এই ঘাটে। গঙ্গার জলে, টানে টানে সেই পাতর এয়েছিল। কোথেকে এয়েছিল, তা জানিনেকো। তাপর, সে পাতর ঠেকে গেছিল এ ঘাটে। না বাপু, মিছে কেন বলব, সে আমি চোখে দেখিনিকো। শুনিচি। শুনিচি, সে পাতরে ঠাকুর ছেল, ধনমঠাকুর। সে পাতর নিকি সাক্ষাৎ ধর্ম ছেল। ভৈরবও নিকি থাকতেন সেই পাতরে। তা মিছে বলব না, একখানা পতরের মুক্তি পাওয়া গেছিল একবার ঘাটে। মজুমদারের কত্তারা নে গেছিলেন সেই মুক্তি, - এখনও বলে কালো দুলেনি, তা সাখক নাম হয়েছে গো দেশটার কী? না জগদল!বুকে যেন চেয়ে বসেছে গো।”<sup>৪</sup>

“বুড়ি আতপরের ঘরামিপাড়ায় থাকতে পারে না। রাত পোহালেই চলে আসে দুলেপাড়ায়। মার জন্য হরির যেন আর ভাবনা নেই। সেও কেমন একরকম হয়ে গিয়েছে। বয়স হয়েছে। তার উপরে, জমিদারের দৌরাণ্য, বাপ পিতামহের ভিটে ছাড়তে হল।”<sup>৫</sup>

কাঠুরে বউয়ের অভিজ্ঞতা উপনিবেশিক আধুনিকতার এক অন্ধকার অধ্যায়। এখানে শিল্পায়ন মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয় না; বরং নারীর শরীরকে শ্রম ও ভোগ— এই দুইয়ের মধ্যবর্তী এক পণ্যে পরিণত করে। কাঠুরে বউ তাই কোনও বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয়—সেই অসংখ্য নারীর প্রতিনিধি, যাদের জীবন ইতিহাসের চাকা ঘোরায়, কিন্তু ইতিহাসে তাদের অস্তিত্ব লেখা থাকে না।

**গঙ্গা :** সমরেশ বসু বাংলা কথাসাহিত্যে সেই বিরল কথাপ্রস্টা যিনি সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনকে কেবল সহানুভূতির চোখে নয়, বরং নির্মোহ বাস্তবতায় উপস্থাপন করেন। ‘গঙ্গা’ মূলত নদীকেন্দ্রিক জেলে সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামের দলিল।

১৯৫৭ সালে ‘জন্মভূমি’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় ‘গঙ্গা’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সমরেশ বসু এটিকে উৎসর্গ করেন বরণ্য কথাসাহিত্যিক তারাসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে। পরে দীর্ঘকাল অমুদ্রিত থাকার পর ১৯৭৪ সালে লেখকের অনুমতিক্রমে মৌসুমী প্রকাশনী বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয় ও গবেষণা-সমীক্ষণসহ গঙ্গা উপন্যাসের একটি সমৃদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করে। বর্তমানে এই সংস্করণটিই পৃথক গ্রন্থাকারে বাজারে প্রাপ্ত হয়। উপন্যাসটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক সমরেশ বসু বলেন, -

“বাপ-ছেলে মারামারি করছে, বউ-সোয়ামি ছাড়াছাড়ি করছে। এই না মাছমারার জীবন! এক কোটালে বাঁচে, আর এক কোটালে মরে। মাছের প্রাণের চেয়েও তার আয়ু টলোমলো।”<sup>৬</sup>

এই উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রদের পাশাপাশি নারী চরিত্ররাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জেলে জীবনের সংগ্রাম, প্রেম, দারিদ্র্য ও সামাজিক টানাপোড়েনের কেন্দ্রে নারীই প্রধান চালিকাশক্তি। হিমি (হিমালয়া), পাচী, দামিনী, আতর — এই চরিত্রগুলি উপন্যাসের নারীজগতকে বহুমাত্রিক ও অর্থবহ করে তুলেছে।

অনেক ক্ষেত্রে বাঁধা পড়ে ঘরের বউ, সেয়ানা মেয়ে। নিদেনের দিনে মহাজন বলে ওঠে -

“তোমার বাড়িতে যাব হে। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলব। বউয়ের শরীরে কাপড়চোপড় আছে তো। শুনেছি, মেয়েটি তোমার ডাগর হয়েছে।”<sup>১</sup>

**হিমি** : প্রেম, প্রতিবাদ ও আত্মসচেতনতার প্রতীক। হিমি উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র এবং সমরেশ বসুর নারীবোধের একটি শক্তিশালী রূপ। জেলে সম্প্রদায়ে জন্ম হলেও হিমি কেবল সামাজিক নিয়মের অনুসারী নয়; বরং সে নিজের জীবন ও ভালোবাসাকে নিজস্ব শর্তে গড়ে তুলতে চায়। বিলাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রেমকাহিনি নয়, বরং তা একধরনের সামাজিক প্রতিবাদ।

সমরেশ বসুর অভিনবত্ব এখানে যে, তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রূপ ফুটিয়ে তোলেন। হোক সে পোঁটাপাড়ি কিংবা নাকবোঁচা কিংবা রং কাকের অধিক। সে শরীরেই এক এক করে অলংকার পরিয়ে বুক ফুলিয়ে বলবেন, এই তো আমার সুন্দর। যেমন হিমিকে সুন্দরী করে তুলবার জন্য লেখকের কত আয়োজন -

“গায়ে জামা নেই। একখানি শাড়ি পরে এসেছে। গাঢ় নীল দক্ষিণের সমুদ্রের মতো। তার ওপরে ছড়ানো সাদা রঙের ফুল যেন সোনার মতো সোনা খড়কে মাছ ছিটিয়ে দিয়েছে। গায়ের রঙটি কটা কটা। খোলা চুল বাঁধা আছে আলাগা করে। চোখ-মুখ একরকম। দেখে মনে হয় বটে, একটু যেন ভাবগম্ভীর মেয়ে। গড়নটি একটু ছিপছিপে। হাতে গলায় নাকে কানে সোনাও আছে। সাতরকম মিলিয়ে দেখতে ভালোই। বয়স কত আর। দেখে মনে হচ্ছে, ছেলেপুলে হয়নি আজো। গড়ন-পিটনে একটু ছেউটি ছেউটি। অর্থাৎ শরীরখানি অকূল হয়নি, কূলের মুখে এসে থমকে আছে। বর্ষা এলে ভাসবে অকূল পাথারে। আন্দাজে বলা যায় বাইশ-চব্বিশ হবে। কিন্তু সিঁদুরের দাগ নেই কপালে সিঁথেয়। একি বেওয়া না আইবুড়ো বোঝবার জো নেই।”<sup>২</sup>

হিমির চরিত্রে আমরা দেখি— নারীর আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা: সে ভালোবাসাকে গোপন বা লজ্জার বিষয় বলে মনে করে না। আবার হিমির রূপবর্ণনা করেন, -

“টকটকে লাল শাড়ি পরেছে একখানি। তাজা ইলিশ-কাটা গাঢ় রঙের মতো লাল। জামা গায়ে দেয়নি। ... বাছাড়ি নৌকা যেন বড়শিতে গাঁথা মাছ। ছিটকে টেনে চলে যেতে চায়। - রূপখানি তো আছে। তার উপরে কালিন্দী আর রাইমঙ্গলের মোহনার হাঁকা লেগেছে শরীরে। (হিমির যৌবন) ... নাকখানি বেশ উঁচু ছিল। চোখ দুটি তেমন বড়ো নয়। কিন্তু ধার ছিল খুব। - আঁশবঁটির ধার যত দেখতে ইচ্ছে করে তত ভয় হয়। দামিনী ছিল বাজারের তেমনি মেয়ে মানুষ। সেও একখানি আঁশবঁটি যদি তুমি মাছ পাও। দেখলে তোমার মনে হবে, এর চাল-চলন যেন একটু কেমন। আড়তদার কিংবা মহাজনের বউয়ের মতো, ভালোমন্দ খেয়ে, গায়ে গতরে ফেঁপে-ফুলে, হেলেদুলে চলা।”<sup>৩</sup>

হিমি তাই নিছক প্রেমিকা নয়; সে এক আত্মসচেতন নারী, যে নিজের জীবনকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে চায় না। সমরেশ বসু এখানে নারীকে ভোগ্যবস্তু না করে সংগ্রামী মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

হিমিকে যোগ্য আসনে বসালেন লেখক। বলতে গেলে দায় সারলেন। এখন যা দায় পাঠকের। লেখক খেলবেন হিমিকে নিয়ে। আর ওপাশে পাঠক। এতক্ষণে যা হল, তা মাঠ তৈরি করা। ভাস্কর্য খোদাই করলেন, সাজালেন। আবার কোনো দিকে না তাকিয়েই বলে বসলেন, বাহ চমৎকার! এ এক দুঃসাহস। পাঠক এখন ডুবো হিমির রূপে। -

আর একজনের কথা এখানে না বললেই নয়। গাম্বিলতলার পাঁচী। গামলী পাঁচী। এ পাঁচী একজন পরোক্ষ চরিত্র। এখানে এর কোনো প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। তাও আবার এক চিলতে শোনা কথা। বিলাসের বন্ধু সয়ারামের মাধ্যমে এ পাঁচী আসে পরোক্ষভাবে। তারপরও পাঠকমনে এ পাঁচী বড় প্রত্যক্ষ। পাঠক তাকে দ্যাখেনি কখনো। তার ইঙ্গিত ইশারা কিছুই নয়। তবুও। শুধু শুনেছে তার বাড়ন্ত যৌবনের ধুকপুকানির কথা। লেখক আসলে দেখিয়েছেন তার শিল্পসৌন্দর্য। পাঠক ডুবেছে তাতে। অনেক সময় জীবন্ত চরিত্রের আগে আগে হাঁটে এই পাঁচী। সয়ারাম জানে পাঁচীর আসল কথা, আসল রূপ। তাই বিলাস যখন পাঁচীকে ‘বড় একফোঁটা মেয়ে’ বলে তাকিয়ে করে, তখন চটে যায় সয়ারাম। খেঁকিয়ে বলে - ‘পাঁচী যদি একফোঁটা মেয়ে, তবে গায়ের মধ্যে ডাগর আছে কে আর। বাইরে বাইরে বয়স তেরো। ওদিকে ঘরের মধ্যে চোরাবান

এসে যে পনেরো পার হতে চলল, সে খবর কে রাখে।’ লেখক পরে লোভ সামলাতে পারেননি গামলী পাঁচীকে খোলাসা করা থেকে। তিনি নিজেই দাঁড়িয়েছেন সয়ারামের পাশে। পাঁচীকে বলেছেন এভাবে -

“গতরে বল, গতরেও বাড়বাড়ন্ত কম নয় গামলী পাঁচীর। বর্ষার জোয়ার আসেনি। টান মরশুমের জোয়ারে, ছেয়ালো ছেয়ালো ভাবখানি বেশ হয়েছে। নাকখানি একটু বোঁচা। তা, মেয়েমানুষের বেশি তোলা নাকও ভালো নয়। চোখ দুটি ডাগর। শুধু ডাগর নয়, চোখ দুটিতে কিছু কথা আছে। সব চোখে কথা পাওয়া যায় না, চোখের মতো চোখ হলে কী সব কথা যেন থাকে।

হোক সে গামলী পাঁচী। লেখক তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন যে, মেয়ে পাঠক হলে তো অবশ্যই পাঁচীর নাক পড়বার সময় নিজের নাকে হাত বুলিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করবেন। বোঁচা হলেও বলবেন, না ঠিক আছে। এ যৌবনের আবেশ পাঠককে শিহরিত না করে পারে না।”<sup>১০</sup>

মইনুল হাসান লেখেন, গামলী পাঁচী। এ পাঁচী একজন পরোক্ষ চরিত্র। এখানে এর কোনো প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। তাও আবার এক চিলতে শোনা কথা। বিলাসের বন্ধু সয়ারামের মাধ্যমে এ পাঁচী আসে পরোক্ষভাবে। তারপরও পাঠক মনে এ পাঁচী বড় প্রত্যক্ষ। পাঠক তাকে দ্যাখেনি কখনো। তার ইঙ্গিত ইশারা কিছুই নয়। তবুও। শুধু শুনেছে তার বাড়ন্ত যৌবনের ধুকপুকানির কথা।<sup>১১</sup>

অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব : দারিদ্র্য ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তার প্রেমকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করে।

প্রথাভাঙার মানসিকতা : জেলে সমাজের রক্ষণশীলতা সে নিঃশব্দে অস্বীকার করে।

‘গঙ্গা’ উপন্যাসে নারী চরিত্র পুরুষ চরিত্রের ছায়ামাত্র নয়। তারা—শ্রমজীবী সমাজের অর্থনৈতিক বাস্তবতার অংশ, প্রেম ও সম্পর্কের সক্রিয় অংশগ্রাহী পরিবার ও সমাজ টিকিয়ে রাখার মূল ভিত্তি লেখক নারীদের আবেগপ্রবণ বা দুর্বল হিসেবে দেখাননি; বরং তিনি দেখিয়েছেন তাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম, সিদ্ধান্ত ও সহনশীলতাকে।

**বিটি রোডের ধারে :** লেখকদের কাছে এই নারী—কেবল কামনার বস্তু নয় বরং পুঁজিবাদী নগরের উৎপাদিত এক মানবিক বিপর্যয় যে ভালোবাসে, ভয় পায়, স্বপ্ন দেখে—তবু স্বীকৃতি পায় না।

**১. পরিস্থিতি ও ক্ষমতার বিন্যাস :** একটি দৃশ্যে বাড়িওয়ালা ও লোটন বউ—দু’জনের মধ্যে সংঘাতটি কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি শ্রেণি ও লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বাড়িওয়ালা এখানে কেবল একজন ব্যক্তি নয়, সে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ক্ষমতার প্রতীক। লোটন বউ সম্পর্কে বস্তুর সবাই ‘বাড়িওয়ালাকে মধ্যস্থ করে নালিশ’ করতে চায়। এই নালিশে এই কথাটাই বোঝায়, ন্যায়বিচারের পথটিও পুরুষ ও ক্ষমতাবানের হাতে বন্দি।

**২. ভাষা ও দৃষ্টির রাজনীতি :** বাড়িওয়ালার দৃষ্টি ‘মেয়েমানুষটির উপর গিয়ে পড়া’—এটি নিছক তাকানো নয়, বরং নারীর শরীরকে বস্তু হিসেবে দেখার সামাজিক অভ্যাস। তার সংলাপে— “এখানে খ্যামটা খেলা চলবে না”। এই বাক্যে নারীকে সরাসরি যৌন সন্দেহ ও নৈতিক কলঙ্কের জায়গায় ঠেলে দেওয়া হয়, প্রমাণ ছাড়াই।

অন্যদিকে লোটন বউর জবাব— “কী খেলা খেলতে হবে?”- লোটন বউয়ের এই প্রশ্নে রয়েছে ব্যঙ্গ, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিরোধ। সে ভয় পায় না, বরং পুরুষের ভাষাকেই উলটে দেয়।

**৩. লোটন বউ : প্রতিরোধী নারী চরিত্র :** লোটন বউ ‘নির্যাতিত, নির্বাক নারী’ নয়। তার শরীরী বর্ণনা : ‘তালগাছের মতো শরীর’ এবং তার ‘বিচিত্র দোলানি’-এগুলো তাকে দুর্বল নয়, বরং শক্তিশালী ও উপস্থিতিময় করে তোলে। সে বলে — “মারো না দেখি একবার, কত তোমার তাগদ।” এখানে সে ভয়কে অস্বীকার করে, পুরুষের সহিংস হুমকিকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে। নারী কেবল এই উপন্যাসে নিপীড়নের বস্তু নয়, প্রতিরোধের ভাষা।

**৪. পুরুষ সহিংসতার নগ্ন রূপ :** উপন্যাসের বাড়িওয়ালার হুমকি— “তোমার টুটি ছিঁড়ে কুত্তার মুখে ফেলে দেব”। বাড়িওয়ালার এই উক্তি শুধু ব্যক্তিগত রাগ নয়; এই বক্তব্য নারীকে প্রাণীর স্তরে নামিয়ে আনার চেষ্টামাত্র। এবং ভাষার মধ্য দিয়েই

শারীরিক ও যৌন সহিংসতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমরেশ বসু এখানে কোনো অলংকার করেননি— তিনি সহিংস পুরুষ মানসিকতাকে তার কুৎসিত রূপেই তুলে ধরেছেন।

**৫. নীরব দর্শক সমাজ :** “বাদবাকি মেয়ে পুরুষ সকলেই প্রায় রুদ্ধশ্বাস অস্থিরতায় দেখছিল” - এই বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ প্রতিবাদ করে না, কেউ দাঁড়ায় না—এটাই সমাজের আসল চরিত্র, সহিংসতার সময় নীরবতা মানেই ক্ষমতাবানের পক্ষে দাঁড়ানো।

সমরেশ বসুর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, যেখানে— নারী লাঞ্ছিত হলেও, নির্বাক নয়। পুরুষ তার ক্ষমতা ভাষা ও হুমকির মাধ্যমে নগ্নভাবে প্রকাশিত। লোটন বউ তাই শুধু একটি চরিত্র নয়— সমরেশ বসুর সাহিত্যে প্রতিরোধী নারীচেতনার এক স্পষ্ট উচ্চারণ।

**টানাপড়ন :** প্রাত্যহিক নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করে ‘টানাপড়ন’ উপন্যাসে এক গভীর তাৎপর্য বহন করে যোগেন বীটের স্ত্রী টুকি ও পাঁচুর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কটি। যে টুকিকে এক সময় সমাজের চোখে ‘বন্ধ্যা’ ও ‘অশুভ’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল—যার দর্শনও সাতসকালে অমঙ্গলজনক বলে মনে করা হতো। লেখক জানান, -

“তবু মোতির মন করে, উয়ার মুখ না দেখা ভাল। উয়ার সোয়ামির মুখও না দেখা ভাল। অন্য সময়ে না হোক, সাতসকালে বটে। ঘর থেকে বের হয়ে ঘাট যাবার পথে দেখা হতোরা, সে বড় আখরপোতা বিষয়। উ দিনটি ভাল যাবে নাই। এ হল মনের কথা।”<sup>২২</sup>

সেই টুকিই পরবর্তীতে প্রমাণ করে দেয়, তার মধ্যে কোনো ‘অশুচিতা’ বা স্বাভাবিকতার অভাব নেই; বরং সমাজের আরোপিত ধারণাই তাকে কলুষিত করেছিল। টুকি ও পাঁচুর সম্পর্কের সূচনা ঘটে ওস্তাদ অভয় খানের দ্বারা পাঁচুর নকশা অনুমোদনের পর— যে মুহূর্তটি পাঁচুর শিল্পীসত্তার সামাজিক স্বীকৃতিরও চিহ্ন। উল্লেখযোগ্য যে, যোগেন বীট নিজেও একজন নকশাদার এবং পাঁচুর প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি শিল্পীসত্তা ও প্রকৃত সৃজনক্ষমতার দ্বন্দ্বকেও প্রকাশ করে।

উপন্যাসে যোগেন বীটের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার বন্ধ্যাত্বকে প্রতীকী মাত্রা দেওয়া হয়েছে। তার শরীর সক্ষম হলেও সে সন্তান উৎপাদনে যেমন অক্ষম, তেমনি শিল্পসৃষ্টিতেও নিস্প্রভ। ঈশ্বরদাসের সঙ্গে ব্যবসায় যুক্ত হয়ে সে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হলেও তার মধ্যে সৃষ্টিশীলতার প্রাণ নেই। বিপরীতে, পাঁচু দরিদ্র হলেও শিল্পী হিসেবে উর্বর এবং সেই উর্বরতাই টুকির গর্ভধারণের মাধ্যমে দেহগত ও প্রতীকী উভয় স্তরেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিবাহিত জীবনে দীর্ঘদিনের সন্তানহীনতায় টুকির অস্তিত্ব একধরনের অন্তঃসারশূন্যতায় আবদ্ধ ছিল। পাঁচুর সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে সে প্রথম মাতৃত্বের সম্ভাবনা অর্জন করে। এই সন্তানকে রক্ষা করার জন্য টুকির সতর্কতা এতটাই তীব্র যে, সে পাঁচুকেও নিজের কাছে আসতে দেয় না। এখানে টুকি আর নিছক কামনার বস্তু নয়— সে নিজের শরীর, মাতৃত্ব এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন এক নারীতে রূপান্তরিত হয়।

এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটি সূক্ষ্ম ক্ষমতার রাজনীতিও উন্মোচিত হয়। ঈশ্বরদাস যেমন পাঁচুর শিল্পসামর্থ্যকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, তেমনি সমাজে প্রভাবশালী যোগেন বীটের স্ত্রী টুকিও পাঁচুকে ব্যবহার করে নিজের আকাঙ্ক্ষা ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। তবে এই ‘ব্যবহার’ একমুখী নয়— এর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরতা ও প্রয়োজনের জটিল সমীকরণ।

ফলে এতদিন ধরে প্রচারিত ‘বন্ধ্যা নারী’-র ধারণা ভেঙে যায়। টুকির বন্ধ্যাত্ব প্রাকৃতিক নয়, বরং সামাজিক ও সম্পর্কজনিত। উপন্যাস এই সূত্রেই প্রশ্ন তোলে—বন্ধ্যাত্ব কি আদৌ নারীর শরীরের ব্যর্থতা, না কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আরোপিত অপবাদ? টুকি ও পাঁচুর সম্পর্ক সেই প্রশ্নেরই শক্তিশালী প্রতীকী উত্তর।

**বাজার চিত্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম :** উদ্ধৃত অংশে মাধবগঞ্জের বাজার কেবল বাণিজ্যকেন্দ্র নয়, বরং নিম্নবর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা-নির্ভর সামাজিক পরিসর হিসেবে চিহ্নিত। বাউরি, হাড়ি, তাঁতী প্রভৃতি জাতিগতভাবে প্রান্তিক মানুষদের উপস্থিতি এই বাজারকে শ্রেণি ও জাত-বাস্তবতার এক জীবন্ত দলিল করে তোলে -

“গা এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাসি গল্প করা দেখলেই বোঝা যায়, বিক্রির বাটা চালই হয়েছে।”<sup>১৩</sup>

এই হাসি কোনো অবসরযাপন নয়; এটি শ্রমের সাময়িক সফলতার প্রতীক। দীর্ঘ শারীরিক পরিশ্রম ও অনিশ্চিত জীবিকার পর এই স্বস্তি প্রাপ্তিক মানুষের দৈনন্দিন অর্জন।

**বাউরি-হাড়ি নারীর শ্রম ও আত্মপরিচয় :** বাউরি-হাড়ি নারীদের বসে গল্প করা দৃশ্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে নারীকে দেখা যায় স্বনির্ভর শ্রমিক ও বিক্রেতা হিসেবে। বিক্রি শেষ হওয়ার পর তাদের শরীর এলিয়ে বিশ্রাম নেওয়া শ্রমের বাস্তব ক্লাস্তিকে নির্দেশ করে। বুড়ির হাসি ও চুটি টানার বর্ণনা লোকজ জীবনরসকে তুলে ধরে— যেখানে দারিদ্র্যের মধ্যেও মানবিক উষ্ণতা অটুট। উপন্যাসে নারী কোনো নীরব ভুক্তভোগী নয়; বরং অর্থনৈতিক পরিসরে সক্রিয় সত্তা।

**দায়িত্বশীল নারী শ্রম :** ‘তসর লাড়ো’ বিক্রির প্রসঙ্গে মোতির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই উপন্যাসে। পোকা পচে যাওয়ার আশঙ্কা, দুর্গন্ধ, ক্রেতার সন্দেহ— সবই প্রান্তিক উৎপাদকের নিত্যসমস্যা। মোতি প্রতিটি লাড়ো নিজ হাতে পরীক্ষা করে এনেছে, যা তার দায়িত্ববোধ ও পেশাগত সচেতনতা প্রকাশ করে। সে জানায়, -

“উয়াদের মুখের খাবার জিভের ঝোঁয়াদের দ্রব্য।”<sup>১৪</sup>

এই উক্তি খাদ্য, শ্রম ও জীবিকার সরাসরি সম্পর্কটি স্পষ্ট। তসর লাড়ো কেবল পণ্য নয়— এটি শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার উপকরণ।

মাছের বাজারে নারীর আধিপত্য মাছের বাজারের বর্ণনায় দেখা যায়—

“বউ বিটিরই বেশি, দু-একজন বুড়া মরদ।”<sup>১৫</sup>

অর্থাৎ মাছ বিক্রির ক্ষেত্রটি নারীনিয়ন্ত্রিত। দরদাম, মাছের মান নির্ধারণ, পরিমাপ— সবই নারীর দক্ষতায় সম্পন্ন। মোতির দরাদরি ও কম দামে ইঞ্জলি কেনা প্রমাণ করে যে সে বাজার-জ্ঞানসম্পন্ন, সচেতন ভোক্তা। এখানে নারী একই সঙ্গে বিক্রেতা, দরদামকারী ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

প্রান্তিক শ্রেণির জীবনবোধ ও সামাজিক অবস্থান বাজার চিত্রে স্পষ্ট। বাজার প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামের কেন্দ্র, নারী শ্রমজীবী সত্তা হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়। জাত, শ্রেণি ও লিঙ্গ —এই তিনটি বাস্তবতা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। সমরেশ বসু প্রান্তিক নারীকে করুণার পাত্র হিসেবে নয়, বরং শ্রম, সচেতনতা ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

**উপসংহার :** সমরেশ বসুর উপন্যাসে লড়াকু শ্রমজীবী নারী সেই মানুষ, যে প্রতিদিন হারে— তবু পরাজিত হয় না। নারীর সংগ্রাম কোনো ঘোষিত আন্দোলন নয়, বরং জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার এক অবিরাম যুদ্ধ।

## Reference:

1. <https://bangla-sahitya.net>
2. ঐ
3. <https://www.annondabajar.com>
4. <https://bangla-sahitya.net>
5. ঐ
6. Subrata, S. D. “যায় যায় দিন : সমরেশ বসুর গঙ্গা.” 19 Apr. 2024
7. <https://banglasahitya.net>
8. ঐ
9. ঐ
10. ঐ

১১. <https://kalikolom.com>
১২. <https://banglasahitya.net>
১৩. ❌
১৪. ❌
১৫. ❌